অস্তিত্ব, অতিথি তুমি

কালীকৃষ্ণ গুহ

মানুষের মাথার উপরে অনন্ত আকাশ রয়েছে— যা শূন্যতা মাত্র, যা অস্তিত্বহীন অথচ সত্য। ওই শূন্যতায় মাথা রেখে মানুষ বাঁচে, ওই না-থাকা আকাশেই তার মুক্তি। এটা কোনো দার্শনিকতা থেকে বলার মতো কথা নয়, কোনোরকম আলংকারিকভাবে বলার কথা এটা নয়। এ একটা অতি সামান্য কথা— অনিবার্য কথা একটা। 'এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়' একজন চাষী বা মজুরও বলতে পারতেন, যেহেতু এই কথাটা বলার জন্য কোনো বুদ্ধি লাগে না। অসংখ্য মানুষ বহু যুগ ধরে কথাটা বলে এসেছেন নিশ্চয়। আমরা স্পষ্ট করে শুনতে পাইনি। কথাটা আমরা স্পষ্ট করে শুনতে পেলাম তাঁদের একজন প্রতিনিধির মুখ থেকে, যাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একেবারে প্রাথমিক স্তরের সত্য বলার জন্য বা বোঝার জন্য প্রায় কোনো বুদ্ধি লাগে না। বেহালা থেকে গড়িয়াহাট যাচ্ছে এমন প্রায় প্রতিটি লোকই বলবে 'গড়িয়াহাট যাচ্ছি' যদিও দু'-একজন 'শেয়ালদা যাচ্ছি'-ও বলতে পারে, যদি তারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে বোঝে যে 'গড়িয়াহাট যাচ্ছি' বলাটা ঠিক হবে না

কোনো কারণে— ঠিক হবে 'শেয়ালদা যাচ্ছি' বলা। এখন, এই না-থাকা অস্তিত্বহীন আকাশটাকে মাথার উপরে নিয়ে মানুষ বাঁচে, শান্তি পায়, মুক্তিবোধ পায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে আকাশটাকে পেয়ে মানুষ বস্তুজগৎ থেকেই পেয়ে গেল বিপুল এক বিমূর্ততা, যা বস্তুহীন, অস্তিত্বহীন, শূন্য, কিন্তু সত্য।

২.

কিন্তু এতেও তার সবটা প্রয়োজন মিটল না। সে মন থেকে আরো একটা বিমূর্ততা তৈরি করল যা আরো বিচিত্র ও গভীর। সে তৈরি করল 'সর্বশক্তিমান' ঈশ্বরকে, যে স্রষ্টা এবং দাতা, সবকিছুর নিয়ন্তা। অবশ্য এই ঈশ্বরের জন্ম খুব বেশি দিন আগে ঘটেনি। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের ভিন্ন-ভিন্ন ঈশ্বরের জন্ম ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে— এবং মাত্র পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে সমস্তরকম গ্রন্থভুক্ত ঈশ্বরের জন্ম ঘটে গেছে। এই গ্রহে বহু লক্ষ বছর কাটানোর পর, বুদ্ধিচর্চার অনেকখানি উন্নতি ঘটার পর, বহু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পাওয়ার পর, সমস্তরকম প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য মানুষ সৃষ্টি করে নিল ঈশ্বরকে। কীভাবে সৃষ্টি হল মহাবিশ্ব, পৃথিবী, জল, হাওয়া, উদ্ভিদজগৎ, আলো, শব্দ প্রাণ? ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন। উত্তর পাওয়া গেল। কেন জীবনকে বিদীর্ণ করে ও জীবনের অবসান ঘটায় দুঃখ জরা মৃত্যু? ঈশ্বরের ইচ্ছায়। উত্তর পাওয়া গেল। কেন বাঁচার এই অনির্বচনীয় আনন্দ, কেন অনন্তকাল বেঁচে থাকার বাসনা? ঈশ্বরের দান। উত্তর পাওয়া গেল। তবু, মনে হয়, উত্তর পাওয়াটাই শেষ কথা নয়। শেষ কথা, ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে একটি বিমূর্ততার সঙ্গে সংযোগস্থাপন। বিমূর্ততার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের দুটি সার্বজনীন উপায় রয়েছে মানুষের হাতে। প্রথমটি আকাশ, দ্বিতীয়টি ঈশ্বর। 'যদি কালপুরুষের দেখা / আর না পাই মধ্যরাতে / তবে পৌষালি পার হয়ে / বলো কীভাবে দাঁড়াবো একা?' আকাশে তাকিয়ে কালপুরুষকে পেতে হবে মধ্যরাতে। উন্মাদ হওয়া চলবে না, সুস্থিরভাবে বাঁচতে হবে। 'হে ঈশ্বর, আমিও তোমার মতো নন্দিত, উদ্ভাসিত একটি দিঘির।'

এইভাবে নিজের অবস্থান বুঝে নিতে হবে। উন্মাদ হয়ে যাওয়া চলবে না। আকাশ এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করে, অর্থাৎ বিমূর্ততার সঙ্গে সংযোগস্থাপন করে, উন্মাদের পথ থেকে প্রতিদিন ফিরে আসতে হবে সুস্থিরতায়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, ঈশ্বরকে পাওয়ার প্রশ্ন নেই, যেহেতু, বলাই বাহুল্য, ঈশ্বর নেই। ঈশ্বরকে না-পাওয়ার ফলে যে কান্না জমে উঠেছে মানুষের মধ্যে, যুগ-যুগ ধ'রে, তা থেকে মহত্তম সাহিত্যের জন্ম হয়েছে মহত্তম সংগীত ও শিল্পকলার জন্ম হয়েছে। শুধু এই কারণেই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ঈশ্বরের জন্যই মানুষ অংশত উন্মাদ হতে পেরেছে, পেরে, মুক্তির স্বাদ পেয়েছে এবং ঈশ্বরই চেতনাবিদ্ধ মানুষকে সম্পূর্ণভাবে উন্মাদ হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে। ঈশ্বরকে কালো পঙ্গু ও বধির নাস্তিকের কম্পমান ধন্যবাদ জানাই। সেই মহত্তম বিমূর্ততাকে ধন্যবাদ!

৩.

বাঁচা কী? বা, কীরকম? 'ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি' যিনি বলেন তাঁর ওই ঘুমিয়ে-পড়া নিয়ে যে বাঁচা তা কীরকম? বাঁচতে-বাঁচতে একদিন বাঁচার কৃতজ্ঞতার ঘোষণা করে 'সব জন্ম শুদ্ধ জন্মঋণ' তার কাছে জীবন কেমন? এইসব কথা বুঝে-নেয়ার প্রশ্নে মৃতদের দিক থেকে কুয়াশা নেমে আসে। সবটা বোঝা যায় না। এই বোঝা-না-বোঝা থেকে, এইসব প্রশ্নের আলোড়ন থেকে, বেদনাবোধ থেকে, শিল্পের জন্ম— সাহিত্য সংগীত চিত্রকলার জন্ম। এখন, যদি কোনো সান্ধ্যসভার একটি প্রান্তিক চেয়ার থেকে চাঁদ কিংবা মিহির তাঁদের আলস্য বজায় রেখেই প্রশ্ন করেন 'জানলেন কী করে?' তাহলে ওঠে দাঁড়িয়ে বলতে হবে আমাকে, 'জানা থেকে বলছি না কিছু, না-জানা থেকে বললাম কথাটা।' অথবা যদি সন্দীপন তাঁর আশ্বাসচ্যুত অনুনাসিকতার ঘোষণা করেন 'এসব ঠিক বলছো না হে' তাহলেও বলতে হবে প্রায় একই কথা, 'অনেকরকম ভুল বলার মধ্যে এটি একটি। এই বলারও বিমূর্ততা আছে দাদা।' এইসব আছে। তা সত্ত্বেও আমি ভাবি যাঁরা বলেছিলেন 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর' বা 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল' বা 'মানুষের সন্দেহ ঘৃণায় আমার অস্তিত্ব আজো উবে যায় নি তো?' বা 'মৃত কিশোরীর অশ্রুত সুরে যাত্রা আবার' বা 'রমণীদের রক্তক্ষরণ হচ্ছে আজ মহাউৎসবের দিনে' বা 'প্রবাহিত মনুষ্যত্ব, কে কাকে পাথর ছুঁড়ে মারতে চায়?' বা শেষ পর্যন্ত 'মাথার ভিতরে এক বোধ কাজ করে', কী হয়েছিল তাঁদের, অথবা, কী দেখতে পেয়েছিলেন তাঁরা? জানিনা, তাকিয়ে থাকি, যেভাবে উন্মাদ তাকিয়েছে ঘোরতর উন্মাদের দিকে!

শিল্পের মধ্য দিয়েও— সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে— মানুষ চেয়েছে বিমূর্ততার সঙ্গে সংযোগস্থাপন। এটি তার তৃতীয় উপায়। যাদের সামনে দ্বিতীয় উপায়টি খোলা নেই আর, তাদের কাছে এটি দ্বিতীয় উপায়। সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা ভাস্কর্য মানুষের সত্যিই কোনো কাজে আসে না, যে কথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার অসহায়ভাবে বলার চেষ্টা করেছেন। খবরের কাগজের 'আধুনিক' লেখক এসব কথা নিয়ে ব্যঙ্গ করে আত্মতৃপ্তি পেতে চাইলেও কিছু করার নেই! শিল্প-সাহিত্য মানুষের 'কাজে' লাগে না বলেই অধিকাংশ মানুষ শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে কোনোরকম যোগা-যোগ না রেখেই তাঁদের জীবন কাটিয়ে দেন। কিন্তু বিশেষ অনুভূতিপ্রবণ মানুষের জীবন কাটে শিল্প-সাহিত্য-সংগীতের আশ্রয়ে, অনিবার্য প্রয়োজনবোধ থেকেই। অনুভূতিদেশ থেকে আলো না পেলে কোনো সার্থক শিল্পই রচিত হতে পারে না, আমি এই আর্ষবাক্যে বিশ্বাস করি। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যতো বড়ো বুদ্ধিকেই কাজে লাগানো হোক না কেন তা শেষপর্যন্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি। যে শিল্প রচনা করে অংশত উন্মাদ হতে হয় তাকে। বুদ্ধির একটি স্তর ধসে না গেলে কেউ উন্মাদ হয় না, এবং বুদ্ধির একটি স্তরকে ধসিয়ে দিতে না পারলে অনুভূতিদেশ থেকে আলো পাওয়া সম্ভব নয়। নিরন্তর যত শিল্প-সাহিত্য রচিত হয়ে চলেছে এই যুগে

অজস্র শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকের হাতে তার প্রায় সবটাই যে আবর্জনা তার কারণ এই যে ওইসব রচয়িতারা উন্মাদ হতে পারেন না, অনুভূতিদেশ থেকে আলো পান না এবং এইজন্য, যে, তাঁদের রচনা বিমূর্ততা অর্জন করতে পারে না, অর্থাৎ, তা এমন একটি ভাঙন খুঁজে পায় না যা অসীম একটি বিস্তার গড়ে দেবে। কী ঘটেছিল, তা সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে বলে দেয় যে লেখা, তা মূল্যবান রচনা হতে পারে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তা সাহিত্য হয়ে ওঠে তখনই যখন সার্থকভাবে বলা থাকে কী মনে হয়েছিল লেখকের বা সেইসব লোকদের, যারা ঘটনাবলির সঙ্গে জড়িত ছিল। ইতিহাস-পাঠ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ইতিহাস ব্যক্তির অন্তর্লোকের অবস্থান বিষয়ে উদাসীন বলেই তা সাহিত্য নয়। আবার ইতিহাস-পাঠ সাহিত্যপাঠের তুল্যমূল্য এইজন্য, যে, তা সময়ের বা গতির অনুচিন্তা জাগায়, জাতিচরিত্রের অনুচিন্তা জাগায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবর্ষের প্রাসঙ্গিকতায় বলি, তার রচনাবলির যে-কোনো একটি পৃষ্ঠা পড়লেই আমার মনে হয় এক পৃষ্ঠা সাহিত্য পড়া হল— যেহেতু প্রায় প্রত্যেকটি পৃষ্ঠাতেই থাকে এই লেখকের অনুভূতির গোপন আলোড়ন। ইনিই বোধহয় একমাত্র লেখক যাঁর গল্প বা উপন্যাসের শুরু বা শেষ না পড়লেও আমার বেশ চলে যায়। শুধু সাহিত্য নয়, সমস্তরকম শিল্পই ব্যক্তির অন্তর্লোককে প্রকাশ করে—যা বিমূর্ত, অর্থাৎ অনিশ্চিত, দ্বন্দ্বময়, গতিতাড়িত, রূপমুগ্ধ, ধ্বনিসচেতন, অভুক্ত, বিমূঢ়, বেদনাহত। এই সূত্রে, সমস্তরকম শিল্পবস্তুই বিমূর্ততার প্রকাশ ঘটায়। যে শিল্প-বস্তুতে বিমূর্ততা প্রকাশ পায়নি তা শিল্প নয়, এই হল আমার বিনীত বক্তব্য। কৃষ্ণনগরের পুতুল শিল্প নয় যেহেতু তা বাস্তবের অনুকৃতি মাত্র একধরনের বুদ্ধি-নির্ভর কারিগরি কুশলতায় নির্মিত। বাঁকুড়ার ঘোড়া শিল্পকর্ম, যেহেতু তার রূপের মধ্যে ঘোড়ার শক্তি গতি এবং রূপের ধারণা সঞ্চারিত হতে পেরেছে—তাতে রয়েছে অতিগঠন ও ভাঙন, যা তাকে দিয়েছে একধরনের বিমূর্ততা।

৪.

আকাশ ঈশ্বর শিল্প, বিমূর্ততার এই তিনটি উৎসের সঙ্গে প্রতিটি মানুষই জড়িত। আকাশ নেই, ঈশ্বর নেই, শিল্প ও জীবনের নির্মিত বা কাল্পনিক অবস্থান নিয়ে— না-থাকা অবস্থান নিয়ে— গড়ে-ওঠা জিনিস। যে শিল্প যা আছে তার বর্ণনা মাত্র, তা শিল্প হিসেবে সার্থক হতে পারে না। প্রকৃতিতে যা আছে তার প্রতি-ফলনের পাশাপাশি শিল্পীকে জুড়ে দিতে হয় তাঁর আবেগ যা বিমূর্ততা তৈরি করে, শিল্পকে সার্থক করে। এই আবেগ অভিজ্ঞতা এবং প্রাকৃতিক রূপের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে, তাকে অপ্রাকৃত করে, রহস্যময় করে, ব্যাখ্যার অতীতে নিয়ে যায়। বিরহবোধ, যা সংগীত এবং সাহিত্যের প্রধান ও স্থায়ী ভিত্তি তাতো আকাশের মতোই প্রাকৃতিকভাবে অস্তিত্বহীন সত্য জিনিস! ভাবতে অবাক লাগে যে মানুষ বস্তুপৃথিবীর বাইরে— আকাশে ঈশ্বরে শিল্পে—অর্থাৎ একটা শূন্যতায় মাথা ডুবিয়ে বাঁচতে চায়। তার বাঁচা শেষপর্যন্ত বিমূর্ত, রহস্যময়, বিরহকাতর, ব্যাখ্যাতীত। অস্তিত্ব, অতিথি তুমি! □

[নিবন্ধটির নামকরণের জন্য সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে লেখকের ঋণ রইল]